বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

মা সি ক

কুতুববাগ দরবার শরীফের মুখপত্র

আত্মার আলো

সুফিবাদই শান্তির পথ : খাজাবাবা কুতুববাগী

ঢাকা বৃহস্পতিবার ৮ মে ২০১৪ ॥ ২৫ বৈশাখ ১৪২১ ॥ ৮ রজব ১৪৩৫ ॥ পরীক্ষামূলক প্রকাশনা ॥ সংখ্যা ২

হাদিয়া : ১০ টাকা

ইসলাম ধর্মে যত প্রকার প্রার্থনা, আরাধনা উপাসনা, রিয়াজত সাধনা, জিকির-আজগার যা কিছু আছে তার মধ্যে নামাজই সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত

শাহসুফি আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ হযরত জাকির শাহ নক্‌শবন্দি মোজাদ্দেদি

সালাত অর্থ রহমত, দোয়া, প্রশংসা, জিকির স্মরণ ইত্যাদি যা আরবিতে বলা হয় 'সালাত'। ফার্সিতে বলা হয় নামাজ, বাংলায় বলা হয় প্রার্থনা এবং ইংরেজিতে বলা হয় (prayer)। আল্লাহ তায়া'লা বান্দাদের ওপর তৌহিদের পর নামাজের চেয়ে বেশি প্রিয় আর কোনো জিনিস ফরজ করেননি।

আল্লাহ তায়া'লা পবিত্র কোরআনের সূরা আনকাবূত, আয়াত-৪৫-এ বলেছেন, **ইন্নাছ্ ছ্বালা-তা তান্‌হা আনিল ফাহ্‌শা-ই ওয়াল মুনকারি** অর্থ– নিশ্চয়ই নামাজ, অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।

সূরা-বাকারাহ, আয়াত- ৭

খাতামাল্লা-হু আলা-কুলূবিহিম; ওয়া আ'লা-সাম্‌ই'হিম্; ওয়া-আলা আব্‌ছা-রিহিম্ গিশা ওয়াতুওঁ, ওয়ালাহুম আ'যা-বুন আ'জীম

অর্থ- আল্লাহ তাদের অন্তরে ও তাদের কানে মোহর মেরে দিয়েছেন, তাদের চক্ষুর ওপর পর্দা রয়েছে, তাদের জন্য আছে কঠর শাস্তি ও ওয়াইল দোজখ।

খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজান হুজুর

কুতুববাগী ক্বেবলাজানকে দেখলে আল্লাহর কথা মনে হয়

সাবেক রাষ্ট্রপতি আলহাজ্ব হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ

উপস্থিত খাজাবাবা কুতুববাগী এবং আশেকান, জাকেরান ভাইয়েরা এবং পর্দার আড়ালের বোনেরা আস্‌সালামু আলাইকুম।

সর্ব প্রথমে আল্লাহর দরবারে হাজার শুকরিয়া আদায় করছি। হাজার দরুদ পাঠ করছি আমাদের প্রিয় নবী (স.)-এর সমীপে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আমাদের ক্বেবলাজান হুজুরকে। ভালোবাসা জানাচ্ছি আমার আশেকান ভাই-বোনদের। একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই– আজকে শুক্রবার পবিত্র দিন, রাসুলেপাক (স.) বলেছেন, শুক্রবার মুসলমানদের জন্য ঈদের দিন। অতএব, এটি একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিন। এই বিশেষ দিনে আমরা ক্বেবলাজান হুজুরের কাছ থেকে মোনাজাত শুনবো, উনি বিশ্ববাসীর শান্তি ও কল্যাণের জন্য দোয়া করবেন। তাই সে জন্য বলবো, আজকের এই দিনটি অতি ফজিলতপূর্ণ দিন।

পৃথিবী বদলে যাচ্ছে, আগের পৃথিবী নেই। মানুষ দিন দিন পথভ্রষ্ট হচ্ছে। পথ হারিয়ে ফেলছে, নামাজ ছেড়ে দিচ্ছে, পাপের পথে এগিয়ে চলেছে। সেই পথ থেকে মানুষকে সৎ পথে ফিরিয়ে আনার একমাত্র উপায় হলো সমাজের কামেল পীর সাহেবরা। ওনাদের কাছে গেলে যে নসিহত ওনারা করবেন, তাতে মানুষের জীবন পরিবর্তন হবে। আমি যখন রাষ্ট্রপতি ছিলাম তখন থেকে আজ পর্যন্ত বিপদে-আপদে পীর সাহেবদের দরবারে ছুটে গিয়েছি এবং আমার মনে হয় তাঁদের দোয়ার কারণে আমি বেঁচে আছি। ভালো আছি। হাদিসে আছে– যে মানুষকে দেখলে আল্লাহর কথা মনে হয়, যে মানুষকে দেখলে রাসুলেপাকের (স.) কথা মনে পড়ে, যে মানুষকে দেখলে পরকালের কথা মনে হয়, তিনিই যথার্থ অলি! আমার প্রশ্ন– ক্বেবলাজান হুজুরকে দেখলে সে কথা মনে হয় কি না? এত সুন্দর চেহারা! এত সুন্দর ভাবগাম্ভীর্যের চেহারা! এমন সুমধুর কণ্ঠ! ওনাকে দেখলে পরকালের কথা মনে হয়, রাসুলেপাকের কথা মনে হয়, আল্লাহপাকের কথা মনে হয়।

মহাপবিত্র ওরছ শরীফ ও বিশ্বজাকের ইজতেমায় বক্তৃতা করছেন আলহাজ্ব হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ –আত্মার আলো

আমি এখানে আসি বহুদিন থেকে সত্য কথা, তিনি আমাকে আদর করেন, ভালোবাসেন। আমার থেকে বয়সে ছোট হলেও তিনি আমাকে সন্তান বলে গ্রহণ করেছেন। এর চেয়ে গর্ব আর কী হতে পারে? একজন অলি-আল্লাহর সন্তান– এটাই আমার সবচেয়ে বড় পরিচয়। একটু আগে তিনি বলছিলেন, আমার সৌভাগ্য হয়েছিল কাবা শরীফের ভিতরে যাওয়ার। দুইবার গিয়েছি। আরেকটা সৌভাগ্য হয়েছিল রওজাপাকের ভিতরে রাসুলপাকের যে কবর আছে সে কবর জিয়ারত করার, সুযোগ হয়েছিল হাতে পবিত্র কবর স্পর্শ করার। এই সৌভাগ্য খুব কম মুসলমানের হয়। (২-এর পাতায় দেখুন)

হাদিস

আস্‌সালাতু মিরাজুল মু'মিনিন্

অর্থ– নামাজ মুমিনের জন্য মেরাজ (যার বাংলা অর্থ হলো দেখা বা সাক্ষাৎ)।

তাফসিরে ইবনে কাছির, হাদিসে জিব্রিলে বর্ণনা আছে–

আন্‌তা বু দুল্লাহা কা-আন্‌নাকা তারাহু ফা-ইল্লাম তাকুন্ তারাহু ফা-ইন্নাহু ইয়া রাক

অর্থ– তুমি এমনভাবে সালাতে দণ্ডায়মান হও ও সালাত আদায় কর, যেন তুমি আল্লাহকে দেখতেছ, যদি তুমি দেখতে অক্ষম হও, কিংবা দেখতে না পাও, তাহলে মনে কর আমি আল্লাহ তোমাকে দেখতেছি।

হযরত আলী (রা.) বলেছেন, **লাম্ আ-বুদ্ রাব্বা লাম্ আ-রা-হু**

অর্থ– আমি এমন প্রভুর উপাসনা করি না, যাঁকে আমি দেখি না।

এই দর্শন প্রসঙ্গে হযরত উমর (রা.) ও এরূপ দর্শন লাভের দাবি করিয়া বলিয়াছেন, **রায়া কৃল্‌বি রাব্বী বিনূরি রাব্বী**

অর্থ– আমার প্রভু প্রদত্ত নূরের দ্বারা আমার কৃল্‌ব আমার প্রভুকে দেখিয়াছে। (সূত্র: সিররুল আসরার)

হযরত আনাছ (রা.) হইতে হাদিসে রেওয়াত আছে যথা– **ইন্নামাল্ মু'মিনিনা ইজাকানা ফিস্ সালাতি ফা-ইন্নামা ইউনাজি রাব্বাহু**

অর্থ– নিশ্চয়ই মুমিন ব্যক্তি নামাজের মধ্যে তাহার পালনকর্তার সহিত কথোপকথোন করিয়া থাকে।

রাসূল (স.) বলেন– **লা-সালাতা ইল্লাবি হুজুরী কৃল্‌ব**। অর্থ– হুজুরী দেল ব্যতীত নামাজ শুদ্ধ হয় না।

সূরা মাউন, আয়াত ১ থেকে ৭

১. ***আরআইতাল্ লাযী ইউকাযযিবু বিদ্দীন***

অর্থ– আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে বিচার দিবসকে অস্বীকার করে।

২. ***ফাযা-লিকাল লাযী ইয়াদু'য়্যুল ইয়াতীম***

অর্থ– সে সেই ব্যক্তি, যে এতিমকে দরজা থেকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেয়।

৩. ***ওয়ালা- ইয়াহদ্দু আ'লা-ত্বআ'-মিল মিস্‌কিন***

অর্থ– সে নিজেও দান করে না, অন্যকেও দান করতে উৎসাহিত করে না।

৪. ***ফাওয়াইঁলুল্ লিল্ মুছাল্লীন***

অর্থ– সুতরাং দুর্ভোগ সেই সমস্ত নামাজীর।

৫. ***আল্লাযীনা হুম আ'ন ছালা-তিহিম সা-হূন***

অর্থ– যাদের নামাজে মন বসে না।

৬. ***আল্লাযীনা হুম ইয়ূরা-উনা***

অর্থ– যারা তেমন নামাজ পড়ে; লোক দেখানোর জন্য পড়ে।

৭. ***ওয়া ইয়ামনা'উনাল মা-উন।***

অর্থ– নিত্য ব্যবহার্য বস্তু অন্যকে দেয় না।

তাই যদি কেউ আল্লাহকে লাভ করতে চান, দেখতে চান, পেতে চান, ও মেরাজ বা দর্শন করতে চান, তাহলে প্রত্যেক নর-নারীকে অবশ্যই সালাত আদায় করতে হবে। কেননা ইতিহাসে দেখা যায়, সকল নবী-রাসুল ও অলী-আউলিয়াগণ সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়া'লার নৈকট্য লাভ করেছেন।

হাদিসে কুদসিতে এরশাদ করা হয়েছে– **মা ইয়া যালু আবদি ইয়া তাকাররাবু ইলাইয়া বিন নওয়াফিলি হাত্তা আহাবাব তুহু ফা ইযা আহাবাব তুহু ফাকুনতু সাময়ু হুল্লাযী ইয়াসমাউ বিহী ওয়া বাছারু হুল্লাজী ইয়াবছুরু বিহী ওয়া ইয়াদাহুল্লাতী ইয়াবতিশু বিহা ওয়া রিজলু হুল্লাতী ইয়ামশী বিহা**

অর্থ– বান্দা যখন নফল ইবাদতের দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করে, তখন আমি তাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করি। যখন আমি তাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যে কান দিয়ে সে শোনে, আমি তার চোখ হয়ে যাই, যে চোখ দিয়ে সে দেখে, আমি তার হাত হয়ে যাই, যে হাত দিয়ে সে ধরে, আমি তার পা হয়ে যাই, যে পা দ্বারা সে হাঁটে।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

কিছু সময় ধ্যান করা ৬০ বছর ইবাদত বন্দেগির চেয়ে উত্তম।
–আল হাদিস

আমার আলো

কুতুববাগী ক্বেবলাজানকে

(১ম পাতার পর)

আমার মনে হয় সেই কারণেই আল্লাহপাক আমাকে ভালো রেখেছেন। বাঁচিয়ে রেখেছেন।

একটা কথা– রাসুলেপাকের পর আর কোনো রাসুল আসবেন না কেয়ামত পর্যন্ত। পীর-মাশায়েখ যাঁরা আছেন, তাঁরাই আমাদের পথ দেখাবেন। তাঁরাই আমাদের জীবনের আলো দেবেন। তাই প্রত্যেকটি মানুষকে আমি আবেদন করবো খাঁটি পীরের দরবারে যান; তাঁদের কথা শুনুন, পরামর্শ শুনুন, নছিহত শুনুন, নিজের জীবনকে সুন্দরভাবে পরিচালিত করুন। আমাদের জীবন সুন্দর হবে। সারা পৃথিবীতে মুসলমানরা আজ বিপদের সম্মুখীন, সমস্ত মুসলমানের দেশে আজ বিশৃঙ্খলা– লিবিয়া বলেন, সিরিয়া বলেন, প্যালেস্টাইন বলেন, আফগানিস্তান বলেন, ইরাক বলেন; সমস্ত মুসলমানের দেশে আজ বিশৃঙ্খলা। আমাদের মুসলামনের দেশ; আমাদের দেশে যেন কোনো বিশৃঙ্খলা না হয়। সেদিকেও আমরা দৃষ্টি রাখবো। আমরা সবাই ভাই ভাই হয়ে বাস করতে চাই। আমরা সবাই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে নিজেদেরকে আবদ্ধ রাখতে চাই। আমাদের মধ্যে ভেদাভেদ থাকবে না। সেই প্রতিশ্রুতি হোক আজকের দিনে। আমরা প্রমাণ করবো, মুসলমানের রাষ্ট্র হলেও আমাদের মধ্যে কোনো বিশৃঙ্খলা নেই।

আমি এখানে বারবার আসি, সেই কারণে বলছি– বিপদে-আপদে পীর ক্বেবলাজান আমাকে সাহায্য করেছেন। বড় বিপদে পড়েছিলাম, কুতুববাগী পীর ক্বেবলাজান আমাকে সাহায্য করেছেন। উনি আমাকে বিপদমুক্ত করেছেন। ওনার কাছে আসেন, বিপদে-আপদে আসেন, বিপদমুক্ত হবেন। খাজাবাবার দোয়া পাবেন, আমার ব্যক্তিগত জীবন থেকে আমি এই কথাগুলো বলছি। প্রত্যেকটি দরবারে গিয়েছি, আমি এত সুন্দর দরবার কোথাও দেখিনি। এত সুশৃঙ্খল দরবার কোথাও দেখিনি। খাজাবাবার মতো এত সুন্দর মানুষ কখনও দেখিনি। আসুন, আমরা সবাই মিলে ওনার কাছে দোয়া চাই। একটু পরে মাহফিলে উনি মোনাজাত করবেন আমাদের জন্য, যেন আমাদের জীবন ওনার মনের মতো করে সাজাতে পারি। আমাদের জীবন যেন সুন্দর হয়, আল্লাহর কাছে সেই দোয়াই চাইবো। উপস্থিত হুজুরক্বেবলাজান হাজার বছর বেঁচে থাকুন। হাজার বছর বেঁচে থাকুন। কোটি কোটি মানুষের জীবন সুন্দর হোক ওনার দোয়ায়। বাবার কাছে দোয়া চেয়ে, আপনাদের কাছে দোয়া চেয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। ইনশা আল্লাহ আবার দেখা হবে। আস্সালামু আলাইকুম।

আলহাজ্ব হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি
অনুলেখক: প্রতিবেদক

কবিতায় মুর্শিদ বন্দনা

ধন্য আমার জীবন

রেবেকা সুলতানা রোজি

ধন্য আমার নয়নখানি
ধন্য আমার প্রাণ
এত সুন্দর ধরণী তবু
হয়েছিল সব ম্লান।

দেখেছি সাগর, পাহাড়-পর্বত
দেখেছি বিশ্বালয়
সবই যেন ফিকে ছিল
এখন মনে হয় ।

পূত-পবিত্র তুমি বাবা
রায়হানুল কুলব
জাকেরগণের বিপদ-আপদ
দাও করে ছল্‌ব

নিগূঢ় প্রেমের দিশায় তুমি
আঁধার ঘরের বাতি
তুমি তরিকতের বাণী
শোনাও দিবা-রাতি।

মানুষ গড়ার কারিগর তুমি
আমি পাপী পথহারা
ইসমে-জাতের জিকির শিখিয়ে
করেছ মাতোয়ারা।

জাহের বাতেন ইলেম দ্বারা
দূর করেছ আঁধার
জীবন শেষের কঠিন পথে
করে দিও পার।

চরণে ঠাঁই দিও বাবা
এই মিনতি জানাই
তোমায় পেলে রাসুল পাওয়া হয়
আর তো চাওয়া নাই।

রাসুল গুণের গুণী বাবা,
আমি মিসকিন-গরিব
রহমতের ভান্ডার যে তোমার
পাক দরবার শরীফ।

কোরআন হাদিস মতে অবশ্যই কামেল পীর-মুর্শিদ ধরতেই হবে

শাহ সুফি আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ হযরত জাকির শাহ নক্‌শবন্দি মোজাদ্দেদি

কামেল পীরের কাছে বাইয়াত, মুরিদ বা শিষ্যত্ব গ্রহণ করার বিষয়ে কোরআনের দলিল।

সূরা মায়িদাহ্, আয়াত-৩৫

ইয়া আইয়্যুহাল লাযিনা আ-মানুত্তাকুল্লা-হা ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওয়াসীলাতা ওয়া জ্বা-হিদু ফী সাবীলিহী লা'আল্লাকুম তুফ্‌লিহুন।

অর্থ– হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করার মতো ভয় কর, তাকে পাবার পথে উছিলা ও মধ্যস্থতা অন্বেষণ বা তালাশ কর। অর্থাৎ উছিলা হলো জামানার কামেল পীর-মুর্শিদগণ এবং আল্লাহর পথে কঠর রিয়াজত ও সাধনা কর এবং জিহাদে আকবর কর। তাহলে আমি তোমাদের সাহায্য করবো, তোমরা সফল কাম হবে।

সূরা ফাতাহ্, ১০ নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন,

ইন্নাল্লাযীনা ইউবা-ই'উনাকা ইন্নামা- ইউবা-ই'উনাল্লা-হা; ইয়াদুল্লা-হি ফাওক্বা আইদীহিম্।

অর্থ– হে নবী, যারা আপনার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করল তারা মূলত আমার হাতেই বাইয়াত গ্রহণ করল, আমার হাত তাঁদের হাতের ওপর রয়েছে। এই আয়াতের দ্বারা প্রমাণ হলো যে, সাহাবীগণ, আসহাবে সুফ্‌ফাগণ যুগে যুগে বাইয়াত পড়িয়েছেন। তাই এখন পর্যন্ত পীর-মাশায়েকগণ বাইয়াত পড়াচ্ছেন এবং অনাগতকাল ধরে পড়াতে থাকবেন।

রাসুল (স.)-এর পরে আমিরুল মু'মিনিন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর হযরত সালমান ফারসী (রা.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর হযরত কাসেম বিন মোহাম্মদ বিন আবু বকর সিদ্দিক (রা.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রহ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর সুলতানুল আরেফীন হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (কু. ছি. আ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর হযরত আবুল হাসান খেরকানী (কু. ছি. আ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর হযরত আবু আলী ফারমুদী তুসী (কু. ছি. আ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর হযরত খাজা ইয়াকুব ইউসুফ হামদানী (রহ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর খাজায়ে খাজেগান হযরত আবদুল খালেক আজদেদানী (রহ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর হযরত শাহ খাজা মাওলানা আরিফ রেওগিরী (রহ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর হযরত খাজা মাহমুদ আনজির (রহ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর হযরত খাজা শাহ আজীজানে আলী আররামায়তানী (কু. ছি. আ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর হযরত খাজা মাওলানা মোহাম্মদ বাবা ছাম্মাছী (কু. ছি. আ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর হযরত শাহ আমীর সৈয়দ কালাল (রহ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর শামসুল আরেফীন হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নক্‌শবন্দি বোখারী (রহ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর হযরত আলাউদ্দিন আত্তার (রহ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর হযরত মাওলানা ইয়াকুব চরখী (রহ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর হযরত খাজা ওবায়দুল্লাহ আহরার (রহ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর হযরত শাহসুফি জাহেদ ওয়ালী (রহ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর হযরত শাহ দরবেশ মোহাম্মদ (রহ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি খাজেগী এমকাঙ্গী (রহ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর হযরত খাজা মুহাম্মদ বাকীবিল্লাহ (কু. ছি. আ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর ইমামে রাব্বানী, কাইউমে জামানী, গাউছে ছামদানী হযরত শায়েখ আহম্মদ শেরহিন্দী মোজাদ্দেদ আল ফেছানী (রহ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর হযরত শেখ সৈয়দ আদম বিন নূরী (কু. ছি. আ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর হযরত সৈয়দ আব্দুল্লাহ আকবারাবাদী (রহ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর হযরত মাওলানা শেখ আবদুর রহীম মোহাদ্দেছে দেহলভী (রহ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর হযরত মাওলানা শাহ অলীউল্লাহ মোহাদ্দেছে দেহলভী (রহ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর হযরত মাওলানা শাহ সৈয়দ আহমদ বেরলভী (কু. ছি. আ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর হযরত শাহসুফি নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (রহ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর হযরত মাওলানা শাহসুফি ফতেহ আলী ওয়ায়েসী রাসুলে নোমা (রহ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর হযরত মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী শাহ মেহেদীবাগী (রহ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর হযরত মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ খাজা মুহাম্মদ ইউনুছ আলী এনায়েতপুরী নক্‌শবন্দি মোজাদ্দেদি (কু. ছি. আ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর মোজাদ্দেদে জামান শাহান শাহে তরিকত হযরত মাওলানা আবুল ফজল সুলতান আহমদ চন্দ্রপুরী নক্‌শবন্দি মোজাদ্দেদি (রহ.) বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর শাহান শাহে তরিকত মোফাছছিরে কোরআন শাহ সুফি আলহাজ্ব হযরত মাওলানা কুতুবুদ্দীন আহমদ খান মাতুয়াইলী (রহ.) নক্‌শবন্দি মোজাদ্দেদি (কু. ছি. আ.) ক্বেবলাজান হুজুর বাইয়াত পড়িয়েছেন। এরপর তারই ধারাবাহিকতায় আমার দরদী মুর্শিদের কাছ থেকে খেলাফতপ্রাপ্ত হয়ে আমি খাকছার জাকির বাইয়াত পড়াচ্ছি এবং ধারাবাহিকভাবে এই বাইয়াতের ধারা কামেল পীর-মুর্শিদের মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।

সূরা নিছা, রুকু-৮, আয়াত-৫৯

ইয়া আইয়্যা-হাল্লাযিনা আমানু আত্বি'উল্লা-হা ওয়া আত্বি'উর্ রাসুলা ওয়া-উলিল্ আম্‌রি মিন্‌কুম্।

অর্থ– হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করো, তবে তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও রাসুলের অনুগত হও এবং রাসুলের ইত্তেবা, পায়রুবি কর। তোমাদের কওম ও জামানায় যাঁরা সাহেবে হুকুম ও কামেল পীর-মুর্শিদ তাঁদের অনুগত হয়ে যাও এবং তাদের পায়রুবি কর।

রাসুল (স.) ফরমান– 'আস্ শাহিকু ফি কাওমিহি কান্ নাবিয়্যি ফি উম্মাতিহি।'

অর্থ– তোমাদের কওমে (জামানায়) যাঁরা কামেল মুর্শিদ পাবে, তাঁদেরকে রাসুলতুল্য ভলোবাসবে, যেরকম আমার সাহাবাগণ আমাকে ভালোবেসেছেন তদ্রুপ তোমরাও তোমাদের কামেল মুর্শিদকে ভালোবাসবে।

খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজান থাইল্যান্ড সফরে অসংখ্যা বৌদ্ধধর্মসহ অনান্য ধর্মাবলম্বীদের নকশাবন্দিয়া মোজাদ্দেদিয়া সত্য তরিকার বাইয়াত পড়ান –আত্মার আলো

জামে উল উছুল সূরা মোহাম্মাদের তাফসিরে আছে– হযরত ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী (রহ.), যিনি তৎকালীন জগৎবিখ্যাত তাফসির কারক (বিশারদ) ও তাফসিরে কবীরের লেখক। তিনি হযরত ইমাম ছাঞ্জালী বা নাজিমুদ্দীন কোবরা (রহ.)-এর কাছে মুরিদ হওয়ার জন্য যান। ইমাম ফখরুদ্দীন রাজীর ভিতরে এলেমের কিছুটা ফখর (অহঙ্কার) থাকার কারণে তিনি বলেছেন, আমার কাছে মুরিদ হলে তোমার ইলেম ভুলে যেতে হবে। অর্থাৎ মূর্খের মতো থাকতে হবে। এই কারণে তিনি তার কাছে মুরিদ হলেন না। মৃত্যুর সময় ইবলিস নানা প্রকার ছওয়াল করবে এই চিন্তা করে 'আল্লাহ এক' সম্পর্কে ৩৬০ খানা দলিল মুখস্ত করে রেখেছিলেন।

তাঁর মৃত্যুর (অন্তিমকালে) সময় ইবলিস এসে আল্লাহ তায়া'লার একত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন ও তর্ক-বির্তক আরম্ভ করলে, তিনি ৩৬০ খানা দলিল দ্বারা আল্লাহ তায়া'লার একত্ব সম্পর্কে প্রমাণ করলেন। ইবলিস যুক্তি-তর্ক দিয়ে তাঁর সব দলিল বাতিল (Cancel) করে পরে জিজ্ঞাসা করল, হে ফখরুদ্দীন রাজী! তুমি আল্লাহ তায়া'লার একত্ব সম্পর্কে আর কত দলিল দিতে পারবে? তখন হযরত ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী হতবুদ্ধি হয়ে বলেছিলেন, আমি আর দলিল জানি না। যখন তিনি হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলেন তখন হযরত ছাঞ্জালী বা নাজিমুদ্দীন কোবরা (রহ.) রুহানিতে জানতে পেরে তাঁর প্রতি দয়া হয়েছিল। তাই তিনি বলেছিলেন, হে ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী! তুমি বল আমার আল্লাহ বিনা দলিলে এক। তখন ইবলিস বলেছিল, হে ফখরুদ্দীন রাজী তোমার পিছনে যদি কামেল পীর না থাকত তবে আমি দেখতাম, তুমি কেমন করে ইমান নিয়ে কবরে যাও।

এই ঘটনা থেকে প্রমাণ হলো, ইমাম ফখরুদ্দীন রাজীর মতো জগৎ বিখ্যাত এক আলেম এবং ইমাম হওয়া সত্ত্বেও মৃত্যুকালে কামেল পীরের সাহায্য ছাড়া ইমান নিয়ে কবরে যাওয়া সম্ভবপর ছিল না। তবে কেমন করে বর্তমান জামানার মৌলভী, হাফেজ, ক্বারী, পণ্ডিত, বুদ্ধিজীবী, কবি-সাহিত্যিক, রাজনীতিক ও সুশীলসমাজসহ আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা, কামেল পীর ছাড়া ইমান নিয়ে কবরে যাওয়ার আশা করেন? সম্মানিত পাঠকগণ, এই বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন।

বেলায়েতের প্রমাণ

সূরা কাহাফ, আয়াত– ৬০ থেকে ৮০

উচ্চারণ- 'ওয়া ইয্ ক্ব-লা মূসা লিফাতা-হু লা আব্‌রাহু হাত্তা আব্‌লুগা মাজ্মাআ'ল্ বাহ্‌রাইনি আও আমদ্বিয়া হুক্কুবা। ফালাম্মা বালাগা মাজ্মাআ' বাইনিহিমা নাসিয়া হুতাহুমা ফাত্তাখাযা সাবীলাহূ ফিল্ বাহ্‌রি সারাবা। ফালাম্মা জ্বা-ওয়াযা ক্বলা লিফাতা-হু আ-তিনা গদা-আনা, লাকাদ্ লাক্বীনা-মিন্ সাফারিনা হা-যা নাছবা। ক্বলা আরআইতা ইয্ আওয়াইনা- ইলাছ্ ছাখ্‌রাতি ফাইন্নী নাসীতুল্ হুতা, ওয়ামা আনসা নীহু ইল্লাশ্ শাইত'নু আন্ আয্‌কুরাহূ, ওয়াত্তাখাযা সাবীলাহূ ফিল্ বাহ্‌রি, আজ্বাবা। ক্ব-লা যা-লিকা মা-কুন্না নাব্‌গি, ফারতাদ্দা আ'লা- আ-ছা-রিহিমা- ক্বাছছা। ফাওয়াজ্বাদা আবদাম্ মিন্ ইবা দিনা- আতাইনা-হু রহ্‌মাতাম্ মিন্ ইনদিনা ওয়া-আ'ল্লাম্‌না-হু মিল্লাদুন্না-ইল্‌মা। ক্ব-লা লাহূ মূসা হাল্ আত্তাবিউ'কা আলা আন্ তুআ'ল্লিমানি মিম্মা উ'ল্লিম্‌তা রুশ্‌দা। ক্ব-লা ইন্নাকা লান্ তাস্‌তাত্বীআ' মাই'য়া ছবরা। ওয়াকাইফা তাছ্‌বিরু আ'লা-মা-লাম্ তুহিত্ব বিহী খুবরা। ক্ব-লা সাতাজ্বিদুনী ইন্‌শা আল্লাহু ছ-বিরাওঁ ওয়ালা-আ'ছীলাকা আমরা। ক্ব-লা ফাইনিত্তাবা'তানী ফালা তাস্‌আল্‌নী আ'ন শাইয়িন্ হাত্তা উহ্‌দিছা লাকা মিন্‌হু যিক্‌রা। ফানত্বলাক্বা, হাত্তা-ইযা রাকিবা ফিস্‌সাফীনাতি খারাক্বাহা; ক্ব-লা আখরাক্বতাহা লিতুগরিক্বা আহ্‌লাহা, লাক্বাদ্ জ্বি'তা শাইআন্ ইম্‌রা। ক্ব-লা আলাম্ আকুল ইন্নাকা লান্ তাস্‌তাত্বীআ' মাই'ইয়া ছবরা। ক্ব-লা লা তুআ-খিয্‌নী বিমা নাসীতু ওয়ালা তুর্‌হিক্বনী মিন আমরী উ'সরা। ফানত্বলাক্বা, হাত্তা-ইযা লাক্বিয়া গুলা-মান্ ফাক্বতালাহূ, ক্ব-লা আক্বাতাল্‌তা নাফ্‌সান যাকিয়্যাতাম বিগইরি নাফসিন; লাক্বাদ জ্বি'তা শাইয়ান নুক্‌রা। ক্ব-লা আলাম্ আকুল্ লাকা ইন্নাকা লান্ তাস্‌তাত্বীআ' মাই'ইয়া ছবরা। ক্ব-লা ইন সাআলতুকা আ'ন্ শাইয়িম্ বা'দাহা-ফালা- তুছ্‌হিবনী, ক্বাদ বালাগ্‌তা মিল্লাদুন্নী উ'য্‌রা। ফান্‌ত্বলাক্বা, হাত্তা- ইযা-আতাইয়া-আহ্‌লা ক্বারইয়াতি নিস্‌তাত্বআ'মা- আহ্‌লাহা ফাআ-বাও আইঁ ইউদ্বয়্যিফূহুমা- ফাওয়াজ্বাদা- ফীহা জ্বিদা-রাই ইউরীদু আইঁ ইয়ানক্বাদ্দা ফাআক্বা-মাহ্; ক্ব-লা লাও শি'তা লাত্তাখায্‌তা আ'লাইহি আজ্বরা। ক্ব-লা হা-যা ফিরা-কু বাইনী ওয়াবাইনিকা, সাউনাব্বিউকা বিতা'উয়ীলি মা-লাম্ তাস্‌তাত্বি' আলাইহি ছবরা। আম্মাস্ সাফীনাতু ফাকা-নাত্ লিমাসা-কীনা ইয়া'মালূনা ফিল বাহ্‌রি ফাআরাত্‌তু আন্ আ'ঈবাহা ওয়াকা-না ওয়ারা-আহুম মালিকুই ইয়া'খুযু কুল্লা সাফীনাতিন্ গাছবা। ওয়া আম্মাল্ গুলা-মু ফাকা-না আবাওয়া-হু মু'মিনাইনি ফাখাশীনা-আইইউরহিক্বাহুমা তুগইয়া নাত্তঁ ওয়া কুফ্‌রা। ফা আরাদ্‌না- আইঁইউব্‌দিলাহুমা-রব্বুহুমা- খইরাম্ মিনহু যাকা-তাওঁ ওয়া আক্বরাবা রুহ্‌মা। ওয়া আম্মাল্ জ্বিদা-রুফাকা-না লিগুলা-মাইনি ইয়াতীমাইনি ফিল মাদীনাতি ওয়া কা-না তাহ্‌তাহূ কানযুল্লাহুমা ওয়া কা-না আবূহুমা ছ-লিহান, ফাআরা-দা রব্বুকা আইঁইয়াব্‌লুগা-আশুদ্দাহুমা-ওয়া ইয়াস্‌তাখ্‌রিজ্বা- কান্‌যাহুমা, রহ্‌মাতাম্ মির্ রব্বিকা, ওয়ামা ফাআ'ল্‌তুহূ আ'ন আম্‌রী; যা-লিকা তা'উয়ীলু মা-লাম তাছ্‌ত্বি' আলাইহি ছবরা।

কোরআনে হযরত মুসা (আ.) এবং খিযির (আ.)-এর ঘটনা

সহীহ বোখারী ও মুসলিম শরীফে আছে, হযরত উবাই ইবনে কা'বের রেওয়াতে ঘটনার বিবরণে প্রকাশ– রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, একদিন হযরত মুসা (আ.) বনী ইসরাইলের এক সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন, সব মানুষের মধ্যে অধিক জ্ঞানী কে? হযরত মুসা (আ.)-এর জানামতে (৩-এর পাতায় দেখুন)

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

প্রেম কী এবং কেন?

কারী মাওলানা শফিকুল ইসলাম আল মোজাদ্দেদি

প্রথম সংখ্যায় আমি কে? এই কথার ধারাবাহিকতায় আমি কে হাসিল করার লক্ষ্যে প্রেম করতে হবে, প্রেমের মাধ্যমে, 'আমিতে' পৌছতে হবে। তরিকতের ভাষায় বলা হয় 'ক্ষুদি' হাসিল। যা বান্দা+আল্লাহতে=একাকার হয়ে ফানাফিল্লাহ বা বাকাবিল্লাহতে পৌছা যায়। হাদিস শরীফে রাসুল পাক (স.) বলেন, মান আরাফা নাফছাহু ফা ক্বাদ আরাফা রাব্বাহু। অর্থ– যে নিজেকে অর্থাৎ আমিকে চিনেছে সে তার আল্লাহকে চিনেছে।

হাদিসে কুদ্‌সি: কুনতু কানজান মাকফিয়ান আন আহ্‌ বাবতু ফাক্বাদ খালাকতু খালকান। অর্থাৎ– আমি ছিলাম একটি গুপ্ত ধনাগার-ভাণ্ডার। ইচ্ছা করিলাম প্রকাশ হইব, তাই নিজেকে প্রকাশ করার জন্য সৃষ্টি করিলাম।

ব্যাখ্যা : আল্লাহপাক ছিলেন অতি গুপ্ত ধনাগার-ভাণ্ডার। তিনি ইলমে মহিদের দ্বারা নিজেই নিজের ভিতর ডুব দিলেন এবং ডুব দিয়ে দেখলেন এই সুন্দর পৃথিবী আর মাখলুকাত, তাই তিনি নিজের ইচ্ছা মতো সুনিপুণভাবে সব কিছু সৃষ্টি করলেন।

আল্লাহপাক বলেন, আমি স্রষ্টা; সৃষ্টি করতে পারি আবার ভাঙ্গতেও পারি। আমি যদি সৃষ্টি না করি তা হলে আমি আল্লাহর কোনো স্বাদ বা মজা থাকে না। তাই নিজেকে প্রকাশ করার জন্য সৃষ্টি করলেন সৃষ্টির মূল প্রেম। এই প্রেমের কারণেই মহান আল্লাহপাক সৃষ্টি করলেন কুলকায়েনাত ১৮ হাজার মাখলুকাত ও ৮০ হাজার আলম; কিন্তু তবুও তাঁর সৃষ্টির সাধ মিটেনি, তাই সব শেষে সৃষ্টি করলেন মানুষকে শুধু প্রেমের কারণে।

প্রেম হলো সেতুস্বরূপ, প্রেম হলো আকর্ষণ শক্তি, দুটি বস্তুর মিলনের মাধ্যম হলো প্রেম। প্রেম হলো আকর্ষণ। দেখা দেখিতে প্রেম হয়, প্রেমে মিলন ঘটায়, মিলনে জন্ম হয়, জন্মে বিস্তার ঘটায়। তাই আল্লাহকে পাওয়ার একমাত্র মাধ্যম হলো প্রেম। আমার মুর্শিদ কেবলা বলেন, আল্লাহর আরশে আজিম দুটি খুঁটির ওপর অবস্থিত। প্রথম খুঁটি হলো ইবাদত এবং দ্বিতীয় খুঁটি হলো প্রেম। সুতরাং এ কথার দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ প্রাপ্তির পথ হলো ইবাদত এবং প্রেম। অর্থাৎ প্রেমের মাধ্যমেই ইবাদত, এটিই ধর্ম।

> **মুর্শিদ কেবলা বলেন, আল্লাহর আরশে আজিম দুটি খুঁটির ওপর অবস্থিত। প্রথম খুঁটি হলো ইবাদত এবং দ্বিতীয় খুঁটি হলো প্রেম। সুতরাং এ কথার দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ প্রাপ্তির পথ হলো ইবাদত এবং প্রেম। অর্থাৎ প্রেমের মাধ্যমেই ইবাদত, এটিই ধর্ম**

বিশ্ববিখ্যাত আলেম মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি (রহ.)-এর দৃষ্টিতে ঐশী প্রেম হলো সব রোগের মহৌষধ। প্রেম মনকে কর্দমতা ও পাপাশক্তি থেকে মুক্ত করে। প্রেম আত্মাকে পবিত্র করে এবং উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যায়। মুর্শিদ কেবলা খাজাবাবা কুতুববাগী (মাঃজিঃআঃ) বলেন, এশ্‌কে মেজাজী থেকে মানুষ এশ্‌কে হাকিকীতে পৌছে যায় এবং এ ক্ষেত্রে এশ্‌ক বা প্রেম হলো মাধ্যম। অর্থাৎ প্রথমে সাধারণ মানুষকে অসাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রেম করতে হয়। তা হলেই সেই অসাধারণ মানুষের মাধ্যমেই আল্লাহ পর্যন্ত পৌছানো যায়। সেই মানুষ হলো একজন সম্যক গুরু বা পীর-মুর্শিদ। একজন কামেল মুর্শিদের সঙ্গে প্রেম করলে তিনিই আপনাকে পৌছে দিতে পারেন আল্লাহর নৈকট্যে।

তরিকতের ভাষায়– ১. ফানাফিল অজুদ, ২. ফানাফিশ শায়েখ, ৩. ফানাফির রাসুল, ৪. ফানাফিল্লাহ্‌।

১. ফানাফিল অজুদ হলো নিজেকে নিজের মধ্যে বিলীন করে দেওয়া অর্থাৎ নিজেকে এমন মনে করতে হবে যে, আমি কিছুই না। আমি বলতে কিছুই নেই, নিজের হাস্তিকে বা আমিত্বকে চিরতরে দূর করে দেওয়া। এসব বিষয়ের অহংকার দূর করে দিতে পারলেই একজন সাধারণ মানুষ ফানাফিল অজুতের মাকাম বা স্তর লাভ করতে পারেন; কিন্তু এই স্তর কোনোদিনও একা একা লাভ করা যায় না। এই স্তর লাভ করতে হলে একজন কামেল মুর্শিদের শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

২. ফানাফিশ শায়েখ হলো নিজের মুর্শিদের সঙ্গে ফানা বা বিলীন হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ মুর্শিদের সঙ্গে ফানা হতে পারলেই আমিত্বকে দূর করা সম্ভব। তখন আর নিজের বলতে আর কিছুই থাকে না, যা কিছু আছে তা কেবল অন্যের আমি বা আমার বলে কোনো বস্তু নির্দিষ্ট থাকে না। শুধু তুমি আর তুমির মধ্যেই একাত্মতা পোষণ করা।

৩. ফানাফির রাসুল হলো নিজেকে রাসুল প্রেমের দরিয়ায় ডুবিয়ে দেওয়া, যেখানে ডুবলে আর অন্য কিছুর প্রয়োজন থাকে না; কিন্তু এই দরিয়ায় ডুবতে হলে একজন কামেল মোকাম্মেল মুর্শিদের একান্ত সান্নিধ্যের প্রয়োজন হয়। যিনি এই দরিয়ার গভীরতার খোঁজ রাখেন, যেখানে রয়েছে অমূল্য ধন-রত্নের অফুরন্ত ভাণ্ডার, যে ভাণ্ডারের হদিস কোনো মানুষ পেলে নিশ্চয়ই সে পার্থিব সুখ-শান্তির কথা ভুলে রাসুল প্রেমের দরিয়ায় ডুবে থাকবেন।

৪. ফানাফিল্লাহ হলো আল্লাহর সঙ্গে বিলীন হয়ে যাওয়া। কেউ যদি আল্লাহর প্রেমে নিজেকে বিলীন করে দিতে পারেন তবে তার জন্য রয়েছে দোজাহানের অপার সুখ আর চির শান্তির ঠিকানা; কিন্তু এই যে আল্লাহর সঙ্গে ফানা বা নিজেকে বিলীন করে দেওয়ার একমাত্র পথ বা মাধ্যম হলো তার মুর্শিদের উছিলা। মুর্শিদের কৃপা ছাড়া এই স্তরে কেউ কোনোদিনও যেতে বা সিদ্ধি লাভ করতে পারবেন না। কারণ রাসুল প্রেমে ফানা হতে হলে মুর্শিদের একনিষ্ঠ অনুসারী হতে হবে। তাঁর আদেশ-নির্দেশ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করতে হবে। তবেই রাসুলের প্রেম তার হৃদয়ে সদা জাগ্রত থাকবে। আর যার হৃদয় বা কুলবে রাসুলের প্রেম জাগ্রত হবে না, সে কখনও আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারবে না।

প্রেমের জগৎ সব বিচার ও যুক্তির উর্ধ্বে

ঐশী প্রেমের দ্বারা যার হৃদয় পুত-পবিত্র, তার মন সর্ব প্রকার অবিলতা থেকে মুক্ত। ঐশী প্রেমের বলে মাটির দেহ আকাশে উন্নীত হয়। প্রেমের পরশে জড়ো পাহাড় পর্যন্ত সচল হয়ে ওঠে। একদিন এই প্রেমের দ্বারাই তুর পাহাড় জীবন সঞ্চার করেছিল। প্রেম উন্মাদনা ও উন্মত্ততা এনেছিল। হযরত জালাল উদ্দিন রুমি (রহ.) বলেন, আমার সত্তা তারই সত্তার মধ্যে লুকিয়ে আছে– এ গোপন রহস্য-ভেদ প্রকাশ করলে, সমগ্র জগত ওলটপালট হয়ে যাবে। কারণ এই ঐশী প্রেম অব্যক্ত ও জীবনের গোপন রহস্য।

পার্থিব জগতের যাবতীয় সৌন্দর্য পরম সৌন্দর্যেরই আংশিক প্রকাশ মাত্র। পরম সুন্দর সব সৌন্দর্যের মূল উৎস। সূর্যালোকের অভাবে যেমন পৃথিবী অন্ধকারে ঢেকে যায়, তেমনি ঐশী সৌন্দর্যের অভাবে বিশ্বের সব বস্তু মলিন হয়ে পড়ে।

প্রেমই সৃষ্টির মূল তত্ত্ব। পৃথিবী সৃষ্টির কারণ পরম সৌন্দর্যের প্রকাশ, অতএব যেই প্রেম দ্বারা মহান আল্লাহ সমগ্র পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সেই প্রেম তো আল্লাহর সত্তারই নির্যাস। প্রেম দ্বারা মানবাত্মা পরিবর্তিত হয়ে পরম আত্মার স্বভাবে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে অথবা পরমাত্মার রঙে রঙ্গিন হয়ে ওঠে।

এই প্রেম দ্বারাই জড় জগত থেকে আধ্যাত্মিক জগতের সন্ধান লাভকারী জগতবিখ্যাত আলেম মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমির (রহ.) মতে যাবতীয় কর্মের নিয়ন্তা একমাত্র সয়ং আল্লাহ। তিনি মানুষকে কতগুলো কর্মের স্বাধীনতা দিয়েছেন। এই সীমার ভিতর থেকেই মানুষ তার পছন্দমতো কর্ম সম্পাদন করতে পারে, যদিও কর্ম-শক্তি ও কর্মক্ষেত্র আল্লাহরই দান। মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে কারণ মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। আল্লাহ মানুষকে তার স্বাধীন মতানুযায়ী পছন্দ করার শক্তিদান করেছেন।

চুম্বকের আকর্ষণ যেমন বিচ্ছিন্ন লৌহ খণ্ডকে একত্রিত করে, তেমনি প্রেমের আকর্ষণ হলো একরকম বিনা তারে বৈদ্যুতিক আলো জ্বালানোর মতো শক্তি। প্রেমে একজন রোগীকেও সুস্থ করে তুলতে পারে এবং প্রেমের কারণে কঠিন ক্রোধ দমন হয়ে কোমলতায় রূপ নিতে পারে। তখন শত্রুও পরিণত হয় পরম মিত্রতে। প্রেমের কারণেই মানুষের মৃত আত্মাও জীবিত হয়ে ওঠে। বাদশাহকে পরিণত করে গোলামে। প্রেম কারাগারকেও পরিণত করতে পারে কুসুম-কাননে। আবার মাটির দেহ আসমানেও আরোহণ করে এবং যা কখনও মাটিতে খেতে পারে না।

একজন আল্লাহ প্রেমিক সুফি-সাধকের প্রার্থনা আরশে আজিম পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। আল্লাহর প্রেম মানুষের অন্তরকে পার্থিব জগতের প্রতি উদাস বা বিমুখ করে পরকালের প্রতি নিমগ্ন করে তোলে। প্রেমের স্বাদ আশ্চর্যরকম এক অদৃশ্য বস্তু। মুর্শিদ প্রেমের মাধ্যমে একটি মুহূর্তে যতখানি আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করা সম্ভব, প্রেমহীন শতশত বছরের কঠোর সাধনা, রিয়াযত, মোশাহেদায় তা সম্ভব হয় না। এই প্রেমের রাস্তায় চলতে গিয়ে যে ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে তার জন্য আমাদের দেওয়া কোনো অজু-গোসলের প্রয়োজন হয় না। কারণ তার মৃত্যু শহীদের মর্যাদা লাভ করে। প্রেমের জগৎ সব বিচার ও যুক্তি তর্কের উর্ধ্বে।

কোরআন, হাদিস মতে ছদকা এবং মান্নতের বিধান

(শেষের পাতার পর)

খলিফা রাগ করলেই তিনি শাহজাদা সোলায়মান (আ.)-এর কথা বলে দেবেন। এই সমস্ত চিন্তা করে বৃদ্ধা পুনরায় খলিফার কাছে গিয়ে বললেন। হুজুর অভিযোগের বিচার না করে ভিক্ষা বাড়িয়ে দিলেন। এতে আপনি কেয়ামতের দিন নিজেকে ন্যায় বিচারক বলে দাবি করতে পারবেন না। আমি সেদিন কিন্তু বলব খলিফা আমার অভিযোগের বিচার করেননি। খলিফা বৃদ্ধার কথা শুনে বললেন, তোমাকে এসব কথা কে শিখিয়ে দিয়েছে? বৃদ্ধা বললেন, শাহজাদা সোলায়মান (আ.) আমাকে সব কিছু বলে দিয়েছেন। তখন হযরত দাউদ (আ.) শাহজাদা সোলায়মানকে দরবারে ডাকলেন। হযরত দাউদ (আ.) হযরত সোলায়মান (আ.)কে বললেন, তুমি বারবার বৃদ্ধাকে আমার কাছে পাঠিয়ে আমাকে হয়রান করে তুলছ কেন? বাতাস কি আমার অধীন যে, আমি তাকে এনে বৃদ্ধার সামনে বিচার করব? এটা একটা অসম্ভব ব্যাপার। অতএব এ বিষয়ে বৃদ্ধাকে তুমি বারবার কেন পাঠাচ্ছো? হযরত সোলায়মান (আ.) আল্লাহর কাছে বাতাস হাজির করার জন্য দোয়া করার কথা বললেন, হযরত দাউদ (আ.) সোলায়মানকে সঙ্গে নিয়ে হাত উঠিয়ে দোয়া করলেন, সঙ্গে সঙ্গে বাতাস এসে আকৃতি নিয়ে হাজির হয়ে গেল। তখন দাউদ (আ.) বাতাসকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এ বৃদ্ধার আটা কেন উড়িয়ে নিয়েছ? বাতাস উত্তর দিল, হে আল্লাহর খলিফা বৃদ্ধা যখন আটা নিয়ে বাসায় ফিরছিল, তখন গভীর সমুদ্রে একটি জাহাজের তলদেশ ছিদ্র হয়ে যাত্রীরা ও বহু মূল্যবান মালামাল তলিয়ে যাচ্ছিল। এ সময় যাত্রীরা মান্নত করে, যদি তাদের জাহাজ বিপদ থেকে রক্ষা পায়, তাহলে তারা জাহাজের সব মালামাল গরিব দুঃখীদের দান করে দেবে। আল্লাহ দোয়া কবুল করেন। জাহাজ উদ্ধারের নিমিত্তে আমাকে নির্দেশ প্রদান করেন। আমি তখন বৃদ্ধার আটা উড়িয়ে নিয়ে সে জাহাজের তলদেশের ছিদ্র বন্ধ করে দেই। ফলে জাহাজ ও যাত্রীরা মৃত্যু থেকে রক্ষা পায়। হযরত দাউদ (আ.) বাতাসকে জিজ্ঞেস করলেন, জাহাজটি এখন কোথায়? বাতাস বলল, এইমাত্র এই শহরের প্রান্তে সমুদ্র তীরে নোঙর করেছে। তখন তিনি বললেন, তুমি তাহলে যেতে পার, আমি জাহাজের খবর নিচ্ছি। দাউদ (আ.) জাহাজের যাত্রী ও নাবিকদের ডাকলেন, তারা উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, জাহাজের মালামাল গরিব দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করার অঙ্গীকার করেছ। তাই বৃদ্ধাকে মালামালের অর্ধেক দিয়া দিবে। বাকি অর্ধেক গরিব-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করবে। জাহাজের নাবিক ও যাত্রীরা খলিফার আদেশ শিরোধার্য করে নিল। বৃদ্ধাকে তাদের সঙ্গে নিয়ে গেল এবং জাহাজের সমুদয় মালামাল খালাশ করে সঠিকভাবে বণ্টন করে অর্ধেক বৃদ্ধাকে দিয়ে দিল। বাকি অর্ধেক গরিব দুঃখীদের দান করল। এই ঘটনা থেকে জানা গেল, জাহাজের যাত্রীরা এই মহা বিপদ থেকে বাঁচার জন্য মান্নত করল এবং জীবন রক্ষা পেল। পবিত্র কোরআনে এ ঘটনা জানা গেল।

কোরআনের এই ঘটনা দ্বারা প্রমাণ হলো যে, মান্নতের উছিলায় আল্লাহ তায়া'লা মানুষের বিপদমুক্ত করেন, হায়াৎ বৃদ্ধি করেন, বালামছিবত দূর করেন, রিজিক বৃদ্ধি করেন, মান-সম্মান বাড়ান। কাজেই হে সম্মানিত পাঠকগণ! আপনারা গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন যে, কোরআন, হাদিস মতে ছদকা বা মান্নত বিলকুল জায়েজ আছে। তাই দেখা যায় যে, কামেল পীর-মুর্শিদের দরবারে মানুষ আল্লাহর রাস্তায় ছদকা বা মান্নত হিসেবে উট, দুম্বা, মহিষ, ভেড়া, বকরি, মুরগি, চাউল, ডাল, টাকা-পয়সা ইত্যাদি দান করেন। এ সমস্ত মান্নত যখন আল্লাহ তায়া'লা কবুল করেন, তখন মানুষ এই ছদকা-মান্নত কামেল পীর-মুর্শিদের দরবারে নিয়ে হাজির হন এবং ছদকা-মান্নতগুলো কামেল পীর-মুর্শিদগণ মানবের সেবায় বিতরণ করেন।

কোরআন হাদিস মতে অবশ্যই কামেল পীর-মুর্শিদ ধরতেই হবে

(২-এর পাতায় পর)

তাঁর চাইতে অধিক জ্ঞানী আর কেউ ছিলেন না। তাই বললেন, আমিই সবার চাইতে অধিক জ্ঞানী। আল্লাহ তায়া'লা তাঁর নৈকট্যশীল বান্দাদেরকে বিশেষভাবে গড়ে তোলেন। তাই এ জবাব তিনি পছন্দ করলেন না। এখানে বিষয়টি আল্লাহর ওপর ছেড়ে দেয়াই ছিল 'আদব'। অর্থাৎ– একথা বলে দেয়া উচিত ছিল যে, আল্লাহ তায়া'লাই ভালো জানেন, কে অধিক জ্ঞানী। এ জবাবের কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসা (আ.)-কে তিরস্কার করে অহী নাযিল হল– দুই সমুদ্রের মিলনস্থলে অবস্থানকারী আমার এক বান্দা আপনার চাইতে অধিক জ্ঞানী। এ কথা শুনে মুসা (আ.) প্রার্থনা জানালেন, তিনি অধিক জ্ঞানী হলে তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান লাভের জন্য আমার সফর করা উচিত। তাই বললেন, ইয়া আল্লাহ! আমাকে তাঁর ঠিকানা বলে দিন। আল্লাহ বললেন, থলের মধ্যে একটি ভাজা মাছ নিয়ে নিন এবং দুই সমুদ্রের মিলনস্থলের দিকে সফরের উদ্দেশে যাত্রা করুন। যেখানে পৌঁছার পর থলের ভাজা মাছটি নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, সেখানেই আমার এই বান্দার সাক্ষাৎ পাবেন। মুসা (আ.) আল্লাহর নির্দেশ মতো থলের মধ্যে একটি মাছ নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর খাদেম ইউশা ইবনে নুনও ছিলেন। পথিমধ্যে একটি প্রস্তর খণ্ডের ওপর মাথা রেখে তাঁরা ঘুমিয়ে পড়লেন। এখানে হঠাৎ মাছটি নড়াচড়া করতে লাগল এবং থলে থেকে বের হয়ে সমুদ্রে চলে গেল। মাছটি জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি মু'জেযা প্রকাশ পেল যে, মাছটি সমুদ্রের যে পথ দিয়ে চলে গেল, আল্লাহ তায়া'লা সে পথে পানির স্রোত বন্ধ করে দিলেন, ফলে সেখানে পানির মধ্যে একটি সুড়ঙ্গের মতো হয়ে গেল। ইউশা ইবনে নুন এই আশ্চর্যজনক ঘটনা নিরীক্ষণ করছিলেন। মুসা (আ.) নিদ্রায় ছিলেন। যখন জাগ্রত হলেন, তখন ইউশা ইবনে নুন মাছের এই আশ্চর্যজনক ঘটনা তাঁর কাছে বলতে ভুলে গেলেন এবং সেখান থেকে সামনে রওয়ানা হয়ে গেলেন। পূর্ণ একদিন-একরাত সফর করার পর সকালবেলায় মুসা (আ.) খাদেমকে বললেন, আমাদের নাশতা আনো। এই সফরে যথেষ্ট ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। নাশতা চাওয়ার পর ইউশা ইবনে নুনের ভাজা মাছের ঘটনা মনে পড়ল। সে ভুলে যাওয়ার ওযর পেশ করে বললেন, শয়তান আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। অতঃপর বললেন, মৃত মাছটি জীবিত হয়ে আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে চলে গেল। তখন মুসা (আ.) বললেন, সে ঘটনাটিই তো আমাদের লক্ষ্য ছিল। অর্থাৎ– মাছের জীবিত হয়ে নিরুদ্দেশ হওয়ার স্থানটি ছিল গন্তব্যস্থল। সে মতে তৎক্ষণাৎ তাঁরা ফিরে চললেন এবং স্থানটি পাওয়ার জন্য পূর্বের পথ ধরেই চললেন। প্রস্তর খণ্ডের কাছে পৌঁছে দেখলেন, এক ব্যক্তি আপাদমস্তক চাদরে আবৃত হয়ে শুয়ে আছেন। মুসা (আ.) সেই অবস্থানেই তাঁকে সালাম করলে খিযির (আ.) বললেন, এই জনমানবহীন প্রান্তরে সালাম কোথা থেকে এল? মুসা (আ.) বললেন, আমি মুসা। হযরত খিযির প্রশ্ন করলেন, বনী ইসরাঈলের মুসা? তিনি জওয়াব দিলেন, হ্যাঁ আমিই বনী ইসরাঈলের মুসা। আমি আপনার কাছ থেকে এ বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে এসেছি, যা আল্লাহ তায়া'লা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন। হযরত খিযির বললেন, আপনি আমার সঙ্গে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবেন না। হে মুসা! আমাকে আল্লাহ তায়ালা এমন এক জ্ঞান দান করেছেন যা আপনার কাছে নেই। পক্ষান্তরে আপনাকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন, যা আমি জানি না। মুসা (আ.) বললেন, ইনশা আল্লাহ! আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। আমি কোনো কাজে আপনার বিরোধিতা করব না। হযরত খিযির (আ.) বললেন, যদি আপনি আমার সঙ্গে থাকতেই চান, তবে কোনো বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না। যে পর্যন্ত না আমি নিজে তার স্বরূপ বলে দিই। একথা বলার পর উভয়ে সমুদ্রের পাড় ধরে চলতে লাগলেন। ঘটনাক্রমে একটি নৌকা এসে গেল। তাঁরা নৌকায় আরোহণের ব্যাপারে কথাবার্তা বললেন। মাঝিরা হযরত খিযিরকে (আ.) চিনে ফেলল এবং কোনো রকম পারিশ্রমিক ছাড়াই তাদেরকে নৌকায় তুলে নিল। নৌকায় চড়েই খিযির কুড়ালের সাহায্যে নৌকার একটি তক্তা তুলে ফেললেন। এতে হযরত মুসা (আ,) স্থির থাকতে পারলেন না । বললেন, তারা কোনো প্রকার পারিশ্রমিক ছাড়াই আমাদেরকে নৌকায় তুলে নিয়েছে। আপনি কি এর প্রতিদানে তাদের নৌকা ভেঙে দিলেন, যাতে সবাই ডুবে যায়? এতে আপনি অতি মন্দ কাজ করলেন। খিযির (আ.) বললেন, আমি পূর্বেই বলেছিলাম আপনি আমার সঙ্গে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না। তখন মুসা (আ.) ওযর পেশ করে বললেন, আমি আমার ওয়াদার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। আমার প্রতি রুষ্ট হবেন না। রাসুলুল্লাহ (স.) এ ঘটনা বর্ণনা করে বললেন, হযরত মুসা (আ.)-এর প্রথম আপত্তি ভুলক্রমে দ্বিতীয় আপত্তি শর্ত হিসেবে এবং তৃতীয় আপত্তি ইচ্ছাক্রমে হয়েছিল (ইতিমধ্যে) একটি পাখি এসে নৌকার এক প্রান্তে বসল এবং সমুদ্র থেকে এক চঞ্চু পানি তুলে নিল। হযরত খিযির মুসা (আ.)-কে বললেন, আমার জ্ঞান এবং আপনার জ্ঞান উভয় মিলে আল্লাহ তায়া'লার জ্ঞানের মোকাবিলায় এমন তুলানাও হয় না, যেমনটি এ পাখির চঞ্চুর পানির সঙ্গে রয়েছে সমুদ্রের পানি। অতঃপর তাঁরা নৌকা থেকে নেমে সমুদ্রের কূল ধরে হাঁটতে লাগলেন। হঠাৎ হযরত খিযির একটি বালককে অন্য বালকদের সঙ্গে খেলা করতে দেখলেন। হযরত খিযির (আ.) স্বহস্তে বালকটির মস্তক তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। বালকটি মরে গেল। মুসা (আ.) বললেন, আপনি নিষ্পাপ প্রাণকে বিনা অপরাধে হত্যা করেছেন। এ যে গোনাহর কাজ করলেন। হযরত খিযির (আ.) বললেন, আমি তো পূর্বেই বলেছিলাম, আপনি আমার সঙ্গে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। মুসা (আ.) দেখলেন এ বিষয়টি পূর্ব অপেক্ষা গুরুতর। তাই বললেন, এরপর যদি প্রশ্ন করি তবে আপনি আমাকে পৃথক করে দেবেন। আমার ওযর-আপত্তি চূড়ান্ত হয়ে গেছে। অতঃপর আবার চলতে লাগলেন। এক গ্রামের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় এক বাড়িতে গেলেন এবং তাদের কাছে পানি চাইলেন; কিন্তু ওরা সোজা না করে দিল। ওই বাড়িতেই হযরত খিযির (আ.) একটি ভাঙা দেয়াল দেখতে পেলেন এবং অন্য জায়গা থেকে পানি এনে তিনি নিজ হাতে প্রাচীরটি মেরামত করে দিলেন। মুসা (আ.) অবাক হয়ে বললেন, আমরা তাদের কাছে পানি চাইলে তারা দিতে না করল অথচ আপনি তাদের এত বড় কাজ করে দিলেন। ইচ্ছা করলে তাদের কাছে থেকে পারিশ্রমিক আদায় করতে পারতেন। হযরত খিযির (আ.) বললেন,

এখন শর্ত পূরণ হয়েছে। এটাই আমার ও আপনার মধ্যে বিচ্ছেদের সময়। এরপর খিযির (আ.) উপরোক্ত তিনটি ঘটনার স্বরূপ মুসা (আ.)-এর কাছে বর্ণনা করে বললেন। অর্থাৎ, এ হচ্ছে সেসব ঘটনার স্বরূপ, যেগুলো দেখে আপনি ধৈর্য ধরতে পারেননি। রাসুলুল্লাহ (স.) সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করে বললেন, মুসা (আ.) যদি আরও কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরে থাকতে পারতেন, তবে আরও কিছু জানতে পারতেন।

সূরা কাহাফে, খিযির (আ.) ও মুসা (আ.)-এর ঘটনায় বুঝা গেল এত বড় একজন জলিল কদর নবী, যাঁর সঙ্গে আল্লাহ তায়া'লার কথা হতো, যার মাঝখানে কোনো বাহক জিব্রাইল বা ফেরেশতা ছিল না। মুসা (আ.)-এর মতো এত বড় দলিল-জলিল-কদর নবী হওয়ার পরেও একজন আল্লাহর বান্দা বা কামেল অলির কাছে তাকে যেতে হয়েছিল ইলমে মারেফতের জ্ঞান হাসিল করার জন্য।

কাজেই হে সম্মানিত পাঠকগণ! আপনারা গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন, এই ইলমে লাদুন্না বেলায়েত ও মারেফতের জ্ঞান যেসব কামেল পীর-মাশায়েকের কাছে বা অন্তরে আছে, তাদের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন আছে কি না।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

সাবধান! নিশ্চয়ই অলি-আল্লাহগণের কোন ভয় বা চিন্তা নেই।
–আল কোরআন

আমার আলো

কোরআন, হাদিস মতে ছদকা এবং মান্নতের বিধান

শাহসুফি আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ হযরত জাকির শাহ নক্‌শবন্দি মোজাদ্দেদি

যমযম কূপ বিলুপ্ত হওয়ার পর দয়াল নবীজির দাদা খাজা আবদুল মোত্তালিব যমযম কূপ আবিষ্কার করার জন্য স্বপ্নে আদেশপ্রাপ্ত হলেন। একই স্বপ্ন বারবার দেখার পর আল্লাহ তায়া'লা জানিয়ে দিলেন, 'প্রভাতে এক স্থানে পিপিলিকার বাসা দেখিতে পাইবে এবং কাক ঠোঁট দ্বারা মাটি খুঁড়িতেছে'। খাজা আবদুল মোত্তালিব সেই জায়গায় এসে বাস্তবে দেখতে পেলেন এবং হারেসকে সঙ্গে নিয়ে মাটি খনন করতে লাগলেন। এইস্থানে অল্পকিছু মাটি খননের পরেই কূপের মুখ বের হলো, খাজা আবদুল মোত্তালিব আল্লাহর নামের ধ্বনি দিয়ে কূপের ভিতর থেকে দুটি স্বর্ণের হরিণ, তরবারি ও লৌহবর্ম উত্তোলন করলেন। এসব মালামাল নিয়ে কোরাইশদের অন্যান্য গোত্রের মধ্যে কলহ সৃষ্টি হলো। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে আবদুল মোত্তালিব লটারির প্রস্তাব করায় সবাই রাজি হলো। লটারি শুরু হলো। লটারিতে স্বর্ণ-হরিণ দুটি কাবা গৃহের নামে উঠল এবং অস্ত্রসমূহ আবদুল মোত্তালিবের নামে উঠল। কোরাইশগণ ফাঁকা গেল। এসব ঘটনার পর নিজে স্বনির্ভর হওয়ার জন্য আবদুল মোত্তালিব আল্লাহর দরবারে দশটি পুত্রসন্তান লাভের আশায় মান্নত করলেন– আমার দশটি পুত্রসন্তান হলে একটি সন্তান আল্লাহর নামে কোরবানি করব। আল্লাহ তায়া'লা তাঁর দোয়া কবুল করে দশটি পুত্রসন্তান দান করলেন।

আল্লাহ তায়া'লার কুদরতে আবদুল মোত্তালিব একে একে দশটি পুত্রসন্তান লাভ করলেন, সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র হলেন খাজা আবদুল্লাহ এবং তাঁর বয়স হওয়ার পর আবদুল মোত্তালিবের মান্নত পূরণ করা জরুরি হয়ে পড়ল। একদিন তিনি তার সব পুত্রকে ডেকে মান্নত আদায়ের বিষয় জ্ঞাত করলেন এবং একজনকে কোরবানির জন্য নির্ধারিত করার উদ্দেশ্যে লটারি করলেন। লটারিতে খাজা আব্দুল্লাহর নাম উঠল। পিতা-পুত্র উভয়ে মান্নত পূরণের জন্য প্রস্তুত হলেন এবং আবদুল মোত্তালিব এক হাতে ছুরি, অপর হাতে আবদুল্লাহকে নিয়ে কোরবানির স্থানের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। সেকালে মদিনায় একজন বিশিষ্ট ঠাকুরাণী ছিল। আবদুল মোত্তালিব কতিপয় লোকসহ ঠাকুরাণীর কাছে কোরবানির বিষয় জানালে তিনি পরে আসতে বললেন। সে যুগের প্রথা অনুযায়ী একজন মানুষের জীবনের বিনিময় ছিল দশটি উট। অতএব, ঠাকুরাণী ফয়সালা করলেন দশটি উট এবং আবদুল্লাহ উভয়ের মধ্যে লটারি হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত খাজা আবদুল্লাহর নাম পরিবর্তন হয়ে উটের নাম না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত উটের সংখ্যা বাড়াতে থাকবে। লটারিতে উটের সংখ্যা বাড়তে থাকল। যখন একশ উট পূর্ণ হলো তখন খাজা আবদুল্লাহর নাম না এসে একশ উটের নাম উঠল। তখন একশ উট কোরবানি করে দিলেন এবং খাজা আবদুল্লাহ বেঁচে গেলেন। এখানে প্রকাশ থাকে যে, মান্নতের কারণেই খাজা আবদুল্লাহকে আল্লাহ তায়া'লা বাঁচিয়ে দিলেন।

উল্লিখিত ঘটনায় প্রমাণ হলো যে, কোরআন ও হাদিস অনুযায়ী অলি-আল্লাহদের দরবারে আল্লাহর রাস্তায় কোনো কিছুর নিয়তে মান্নত করা বিলকুল জায়েজ।

মান্নত বা ছদকা প্রমাণ হওয়ার বিষয়ে কোরআনের দলিল–

হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর জবানের কথা, যখন তিনি আল্লাহ তায়া'লার নবী হিসেবে বাইতুল মোকাদ্দাসের রক্ষণাবেক্ষণ ও সেবা-যত্নের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন, তখন বনী ইসরাইলের হেনা নামে এক নেককার ও ধর্মভীরু মহিলা ছিলেন তাঁর স্বামীর নাম ছিল ইমরান। কথিত আছে যে, হেনার এক বোনকে হযরত জাকারিয়া (আ.) বিবাহ করেছিলেন। সে সূত্রে হেনা হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর শ্যালিকা। তখন তিনি আল্লাহর দরবারে মান্নত করেন।

সূরা-আল ইমরান, আয়াত-৩৫

ইয কৃ-লাতিম রাআতু ইমরা-না রাব্বি ইন্নী নাযারতু লাকা মা-ফী বাত্বনী মুহাররারান ফাতাক্বাব্বাল মিন্নী, ইন্নাকা আনতাস সামী'উল আলীম।

অর্থ– ইমরানের স্ত্রী বললেন, তাঁর গর্ভে যে সন্তান আছে, সে ভূমিষ্ঠ হলে তাকে বাইতুল মোকাদ্দাসের সেবক হিসেবে উৎসর্গ করবেন সুতরাং আমার পক্ষ থেকে তা গ্রহণ কর, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

যাঁদেরকে এভাবে মান্নত করা হতো, তাঁরা সারাজীবন বাইতুল মোকাদ্দাসের সেবায় এবং ইবাদাত-বন্দেগির মাধ্যমে নিজ নিজ জীবন অতিবাহিত করত। এ ধরনের নিয়মের কারণে বাইতুল মোকাদ্দাসের খাদেম ও সেবকের সংখ্যা ছিল অনেক। তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাদির জন্য মুসলমানগণ উদারহস্তে দান করতেন। সেবকের সংখ্যা যত বেশি হোক না কেন, তাদেরকে কোনো দিন অসহায় বা অভাবে দিন কাটাতে হয়নি।

হেনা গর্ভধারণের নয় মাস পরে একটি কন্যাসন্তান প্রসব করলেন এবং তার নাম

> আবদুল মোত্তালিব আল্লাহর দরবারে দশটি পুত্রসন্তান লাভের আশায় মান্নত করলেন– আমার দশটি পুত্রসন্তান হলে একটি সন্তান আল্লাহর নামে কোরবানি করব। আল্লাহ তায়া'লা তাঁর দোয়া কবুল করে দশটি পুত্রসন্তান দান করলেন। আল্লাহ তায়া'লার কুদরতে আবদুল মোত্তালিব একে একে দশটি পুত্রসন্তান লাভ করলেন, সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র হলেন খাজা আবদুল্লাহ এবং তাঁর বয়স হওয়ার পর আবদুল মোত্তালিবের মান্নত পূরণ করা জরুরি হয়ে পড়ল। একদিন তিনি তার সব পুত্রকে ডেকে মান্নত আদায়ের বিষয় জ্ঞাত করলেন এবং একজনকে কোরবানির জন্য নির্ধারিত করার উদ্দেশ্যে লটারি করলেন

রাখলেন 'মরিয়ম'; কিন্তু মান্নতের বিষয়ে তিনি খুব নিরাশ হলেন। কারণ ইতোপূর্বে কোনো কন্যাসন্তান বাইতুল মোকাদ্দাসের সেবক হিসেবে কেউ দান করেননি। তাই বিষয়টি হেনার কাছে নৈরাশ্যজনক বলে বোধ হয়েছে। তার ধারণা ছিল হয়ত কন্যাসন্তানকে আল্লাহ তায়া'লা সেবক হিসেবে কবুল করবেন না এবং মসজিদের প্রধান কর্মকর্তাবৃন্দও এতে সম্মতি দেবেন না। এমতবস্থায় তিনি বিষয়টি ভেবে খুবই নিরাশ হলেন এবং কেঁদে কাটাতে লাগলেন। আল্লাহ-তায়া'লা তখন হেনাকে উদ্দেশ করে বললেন, হেনা তুমি যা প্রসব করেছ, তা আল্লাহ তায়া'লা ভালোভাবে জানেন। মরিয়ম পুরুষ না হলেও আল্লাহ তায়া'লা তাকে কবুল করেছেন এবং তার মর্যাদা যথেষ্ট বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাকে নবী জাকারিয়া (আ.)-এর কাছে দাও।

হেনা আল্লাহ তায়া'লার কাছ থেকে সান্ত্বনাবাণী পেয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। অতঃপর সাত বছর পর্যন্ত মরিয়মকে প্রতিপালন করে বড় করে তুললেন। তারপরে একদিন মরিয়মকে এনে হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর কাছে হাজির করে বললেন, হে আল্লাহর নবী, আমি মান্নত করেছিলাম আমার সন্তানকে আল্লাহর ঘরের খেদমতে দিব। দুভার্গ্যবশত আমি একটি কন্যাসন্তান প্রসব করেছি। তবুও আমার মান্নত ঠিক রাখার জন্য একে আপনার হাতে তুলে দিতে এসেছি। আপনি মেহেরবাণী করে একে কবুল করে নিন।

হযরত জাকারিয়া (আ.) তখন মসজিদের মুসল্লিগণকে ডেকে বললেন, আপনাদের মধ্যে কে আছেন যে, এ মেয়েটির ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে রাজি আছেন? মুসল্লিগণ মরিয়মের ললাটে এক জ্যোর্তিময় নূর দেখে তাঁর ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে সবাই একসঙ্গে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। হযরত জাকারিয়া দেখলেন, সকলেই দায়িত্ব গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করছেন। এমতবস্থায় স্বাভাবিকভাবে কারো হাতে মরিয়মের প্রতিপালনের দায়িত্ব অর্পণ করার মধ্যে এক জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। তখন তিনি লটারির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন।

তাওরাত কিতাব লেখার কাজে যে কলম ব্যবহার হতো, সে কলমটি এক এক করে সবার হাতে দেয়ার ব্যবস্থা করলেন। এ কলমটি পানিভর্তি এক পাত্রের মধ্যে ছেড়ে দিলে যার হাতের কলম পানিতে ডুববে না, তিনি মরিয়মের প্রতিপালনের দায়িত্ব লাভ করবেন। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে এক এক করে পরস্পর পানির পাত্রে কলম ফেলতে আরম্ভ করলেন। একে একে সবার হাতের কলম ডুবে গেল। যখন হযরত জাকারিয়া (আ.) কলম পানিতে ফেললেন, তখন কলম আর পানিতে ডুবলো না, পানির ওপর ভেসে থাকল। তখন সবাই হযরত জাকারিয়া (আ.)কে মরিয়মের প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ করলেন। তিনি মরিয়মের জন্য বাইতুল মোকাদ্দাসের একপাশে একটি হুজরা বা কক্ষ নির্ধারণ করে দিলেন। মরিয়ম সেখানে বসে এবাদত-বন্দেগি করবেন এবং শুধু জাকারিয়া (আ.)-এর বাসায় তিনি যাতায়াত করবেন। হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর স্ত্রী মরিয়মের ললাটে অসাধারণ এক উজ্জ্বলতা লক্ষ করে বুঝতে পারলেন এ মেয়ে কোনো সাধারণ মেয়ে নয়। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ কোনো এক মহান ব্যক্তিত্ব লুকিয়ে আছে তাঁর মধ্যে। ভবিষ্যতে এর সন্তানদের মধ্যে হয়ত কাউকে আল্লাহ তায়া'লা মহামানবের মর্যাদা দান করবেন। তাই তিনি মরিয়মকে যথেষ্ট আদর করতেন এবং প্রাণপণ সেবা-যত্ন করতেন।

প্রথম জীবনে মরিয়ম অধিকাংশ সময় খালার কাছে কাটাতেন। পরে অধিকাংশ সময় মসজিদে তাঁর নির্দিষ্ট হুজরা বা কক্ষে ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। হযরত জাকারিয়া (আ.) বাইরে থেকে কক্ষের বা হুজরার তালা বন্ধ করে রাখতেন। এক দিন হযরত জাকারিয়া (আ.) মরিয়মকে তালাবদ্ধ করে রেখে অন্য জায়গায় এসে এমন সমস্যায় পতিত হলেন যে, চারদিন তিনি আর হুজরায় যেতে পারেননি তিনি এক রকম ভুলে গিয়েছিলেন। চারদিন পর হঠাৎ যখন মরিয়মের কথা তার মনে পড়ল, তখন তিনি আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। চারদিন যাবৎ তিনি মরিয়মের খানা-পিনা বা খোঁজখবর নিতে পারেননি। এর মধ্যে তাঁর অদৃষ্টে না জানি কী দুর্দশা ঘটে গেছে। এই চিন্তায় তিনি পাগলের মতো দৌড়ে এসে কক্ষের তালা খুলে দেখলেন মরিয়ম নামাজে দণ্ডায়মান আছেন। তার চারপাশে নানা রকম ফলমূল ও খাদ্যের সমারোহ। তখন তিনি পাঠ করলেন 'আলহামদুলিল্লাহ'।

মরিয়ম নামাজ শেষ করে খালুজানকে সালাম দিলেন। হযরত জাকারিয়া (আ.) দুঃখিত ও লজ্জিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, মা তুমি এ কদিন কেমন ছিলে? আমি এক মহা বিপদের মধ্যে পড়ে তোমার কথা ভুলে গিয়েছিলাম, যার ফলে চারদিন তোমার খবর নিতে পারিনি। তুমি এজন্য আমাকে ক্ষমা করো। হযরত মরিয়ম (আ.) বললেন, খালুজান আপনি কী বলছেন, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না? আপনি ভোরবেলা এসব খাদ্য আমাকে দিয়ে গেলেন। এখন দুপুর না হতেই আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করছেন আমি এ কদিন কেমন ছিলাম! কদিন আপনি কোথায় গেলেন? আপনি তো নিয়মিত দৈনিক দুবার আমার খোঁজখবর নিয়েছেন এবং আমার খাদ্য এখানে পৌঁছে দিচ্ছেন। তবে গতদিনে খাদ্য সম্ভার ছিল একটু ব্যতিক্রম। এতো রকমারি খাদ্য আপনি আর কোনো দিন নিয়ে আসেননি, যার দশ ভাগের এক ভাগও আমি সারাদিন খেতে পারিনি। এখন আপনার কথার প্রকৃত অর্থ আমার বোধগম্য হচ্ছে না।

হযরত জাকারিয়া (আ.) তখন আল্লাহ তায়া'লার কুদরতি লীলার নিদর্শন উপলব্ধি করলেন এবং বললেন, মা তুমি যা বলেছ সবই সত্য; কিন্তু এর মধ্যে আল্লাহ তায়া'লার এক রহস্যময় কীর্তি ও নিদর্শনের বিকাশ ঘটেছে। আমি চারদিন আগে তোমাকে তালাবদ্ধ অবস্থায় রেখে যাওয়ার পরে এক বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতির সম্মুখীন হই। যে কারণে তোমার কথা সম্পূর্ণ ভুলে যাই। চারদিন পর যখন তোমার কথা আমার স্মরণ হয় তখন আমি পাগলের মতো এখানে ছুটে এসে তোমার সামনে বিভিন্ন রকম খাবার সজ্জিত এবং তোমাকে নামাজে দণ্ডায়মান দেখে আমি কিছুটা শান্ত হই। আরও অবাক হই বিগত চারদিন যাবৎ আমি তোমার খবর নিতে পারিনি। আল্লাহ তায়া'লা তোমাকে তা আদৌ আঁচ করতে দেননি। তিনি ফেরেশতাদের দিয়ে তোমার খোঁজখবর নিয়েছেন। এটি ছিল আল্লাহ তায়া'লার এক অপূর্ব রহমতের নিদর্শন। মা তুমি নিয়মিত আল্লাহ তায়া'লার বন্দেগি করে যাও। তোমার অদৃষ্টে আল্লাহ তায়া'লা হয়তো আরও অনেক নেয়ামত রেখেছেন, যা তুমি পর্যায়ক্রমে লাভ করতে সক্ষম হবে। পরবর্তীতে দেখা গেল, আল্লাহ পাকের অপার লীলায় সেই হুজরায় মরিয়মের গর্ভে হযরত ঈশা (আ.) এলেন।

মান্নত করে জাহাজের যাত্রীদের জীবন বাঁচল

একদিন এক বৃদ্ধা এসে হযরত দাউদ (আ.)-এর কাছে নালিশ করলেন, হে আল্লাহর নবী! বাজার থেকে আমি কিছু আটা নিয়ে আসার পথে হঠাৎ বাতাস আমার আটাগুলো উড়িয়ে নিয়ে যায়। এখন আমি খালি হাতে বাড়ি গিয়ে মেহমান ও ছেলে-মেয়েদের কী খাওয়াবো? অতএব, আপনি বাতাসের এই অপরাধের বিচার করুন। দাউদ নবী বললেন, মা বাতাসের বিচার কীভাবে করবো? বাতাস আমার অধীনে নয়। অতএব, তার পরিবর্তে কিছু আটা দিচ্ছি, তুমি আটা নিয়ে বাড়ি ফিরে যাও। বুড়ি মা আটা নিয়ে যখন বাড়িতে রওনা দিলেন। পথের মধ্যে হযরত সোলায়মান (আ.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। তিনি বললেন, হে বুড়ি খলিফার কাছে ভিক্ষা নিতে এসেছিলে? বৃদ্ধা বললেন না বাবা, আমি এসেছিলাম বাতাসের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার উদ্দেশ্যে। হযরত সোলায়মান (আ.) বিস্তারিত শুনে বললেন, তুমি খলিফার নিকটে পুনরায় যাও এবং বল আমি আপনার নিকট এসেছি বিচার প্রার্থী হয়ে, ভিক্ষা নিতে আসিনি। বৃদ্ধা পুনরায় দাউদ (আ.)-এর কাছে গিয়ে আটা ফেরত দিলেন এবং অভিযোগ পেশ করলেন। তখন দাউদ (আ.) বুড়িকে রাজি করিয়ে দশ মণ আটা দিলেন। বুড়ি মা আটার বস্তা বহনকারীদের নিয়ে যখন পূর্বের স্থানে পৌঁছলেন, তখন সোলায়মান (আ.) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন কী হে বৃদ্ধা! তোমার অভিযোগের বিচার পেয়েছ, না ভিক্ষা বাড়িয়ে নিয়েছ? তখন বৃদ্ধা খলিফার ব্যবহারের কথা বললেন। তখন হযরত সোলায়মান বললেন, তুমি আরও অনেক কিছু পাবে। এর জন্য তুমি পুনরায় খলিফার নিকট গিয়ে বাতাসের বিচারের প্রার্থী হও। ভিক্ষা নিয়ে বিদায় হইও না, বৃদ্ধা দেখল খলিফার নিকট গেলেই তার সম্পদ বৃদ্ধি পায়। অতএব, শাহজাদার মতো এক বিরাট ব্যক্তিত্বের কথায় তিনি আবার যাবে। তাতে তার ভয়ের কোনো কারণ নেই। **(৩-এর পাতায় দেখুন)**

প্রধান সম্পাদক : নাসির আহমেদ, সম্পাদকমণ্ডলী : রানা শফিউল্লাহ, আলহাজ্ব জয়নাল আবেদীন, জাকির হোসাইন আজাদী, মোঃ কামরুল ইসলাম, নির্বাহী সম্পাদক : সেহাঙ্গল বিপ্লব
প্রকাশক : মোঃ ইউনূস , কর্তৃক কুতুববাগ মোজাদ্দেদীয়া প্রিন্টিং প্রেস, ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সদর দপ্তর : কুতুববাগ দরবার শরীফ, ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
ফোন : ০২-৮১৫৬৫২৮, মোবাইল : ০১৫৫৬৪১১৮৪১, ০১৭২৩৪৮২২৯৪, ই-মেইল : masikattaralo@gmail.com

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)